প্রকৃতির সমস্ত পূর্ণতায় - রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়
তন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

বীরভূমের গ্রাম হয়ে শান্তিনিকেতন, তারপর পুলিয়ায় দীর্ঘ কুড়ি বছর কাটিয়ে এখন কলকাতায়। যেখানেই গেছেন সেখানকার সংস্কৃতিকে গ্রহণ করেছেন উদার মানসিকতায়।পুলিয়ার কুমোর পাড়া থেকে কলকাতার এই বিশ্বায়নের সংস্কৃতি -এসবের মধ্যেই তাঁর ছবি আঁকার জীবন চলেছে এবং সেসমস্ত ছবি কখনো কোথাও তাদের পথ হারায়নি। তাঁর নিজের কথায় সৃষ্টি কখনো যেন পুকুরের জল হয়ে না দাড়াঁয়, সে হবে বহতা নদীর মতো । এইভাবেই শিল্পী রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সৃষ্টিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে। অজস্র ছবি এঁকেছেন ,বারে বারে বদলেছেন নিজেকে। এই ভিন্ন ভিন্ন শৈলীতেও তাঁর নিজস্বতাটুকু কোথাও হারিয়ে যায়নি। মনে হতে পারে আরো অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করা বা যুগোপযোগী হওয়া উচিত ছিল তাঁর। অর্থাৎ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কখনো কখনো যে বিশেষ একটি ধারা গড়ে ওঠে, যাকে আমরা অনেক সময় খুব সমসাময়িক মনে করি, তেমনটি তো পেলাম না তাঁর কাছ থেকে। কিন্তু যেহেতু তিনি রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় তাই তাঁর ঠিক সেরকমটি হবার কিছু অসুবিধা আছে, কেননা এই নামটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে আর এক মহান শিল্পী আচার্য নন্দলাল বসুর যাঁর হাত ধরে আধুনিক ভারতীয় শিল্পের যাত্রা শুরু, যাঁর গভীর বোধে ভারতশিল্পের পুর্নজাগরণ হয়েছিল। আমরা বিশ্বশিল্পের নানা আন্দোলনের কথা পড়ি, বিপ্লবের কথা বলি ,কিন্তু ভুলে যাই দারিদ্র্য ও অশিক্ষার অন্ধকারে থাকা ,শিল্প সম্পর্কে সম্পূর্ণ জড়বৎ থাকা এমন একটি দেশের অতীত গরিমার কথা বলা। নিজেদের ঐতিহ্য সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার কথা বলা, এবং সেই সময়ে দাঁড়িয়ে দেশীয় শিল্পের শিকড় অনুসন্ধান এবং পরবর্তী প্রজন্মের ভিতরে তার বীজ বিস্তার কম শক্ত কাজ ছিল না । ঠিক এমন এক কঠিন সময়ে আমরা আর্চায হিসাবে পাই অবন শিষ্য নন্দলাল বসু কে আর সেই পথ দিয়েই চলা শরু করেন রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। বাজার-উপযোগী কোনো চিত্ররীতি তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। ছবি দিয়ে কোনো চমক সষ্টি করতেও চাননি। দেশীয় ঐতিহ্য ও লৌকিক শিল্প রীতিনিয়ে তৈরী করেছেন নিজস্ব ঘরানা। তাই তাঁর কাজ একান্তই আমাদের হয়ে ওঠে, আবার একই সঙ্গে ততখানিই আধুনিকও আন্তর্জাতিক হয়ে উঠে ।

যেহেতু শান্তিনিকেতনে পঠন পাঠন তাই কখনো একমুখী বিদ্যার্জন হয়নি। শুধুই ছবি আঁকা নয়,'মানুষটিকে শিল্পী করে দাও' এমন শিক্ষাই দিতেন আর এক শিল্পী শিক্ষক ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মণ। তাই শুধু ছবি আঁকা বা মূর্তি গড়া নয় , ঘর সাজানো থেকে চিঠি লেখা সবেতেই থাকে যেন শিল্পের ছোঁয়া । শিল্পীর চিবোধের প্রকাশ ঘটে যেন তাঁর সামাজিক পরিবেশেও। শিল্পী রামানন্দের বাড়িতে গেলে বোঝা যায় তখনকার শান্তিনিকেতনের শিক্ষার ধারাটি কেমন ছিল । শিল্পী পত্নী কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়ও ছিলেন কলাভবনের ছাত্রী। তাই গোটা বাড়িটিই এক শিল্পের আশ্রম। দেশের নানা অঞ্চলের কা শিল্পের নির্দশন দেখা যাবে বাড়ির আনাচে কানাচে। শুধু তাই নয় নানান ছোটখাটো উপকরণকে নিজের হাতের ছোঁয়ায় বদলে নিয়ে ঘর সাজিয়েছেন। এমন গৃহসজ্জা শুধু রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষেই সম্ভব।

তাঁর ছবিতে কোথাও বিষাদের ছোঁয়া নেই । জীবনের আনন্দ বস্তুতেও সঞ্চারিত হয় । তারাও হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত। এ শুধু রেখার গুণে রঙের গুণে সম্ভবপর নয়। শিল্পের প্রতি গভীর নিবেদন না থাকলে এটা হয়না । দৈনন্দিন জীবনের নানা টুকরো টুকরো ঘটনা উঠে আসে তাঁর পটে । শহুরে বাবু থেকে গ্রাম্য মানুষজন যেমন তাঁর বিষয়বস্তু, তেমনি রাধাকৃষ্ণ বা হর পার্বতীর ছবিও যখন আঁকেন তাঁরাও যেন আমাদের খুব কাছের মানুষ হয়ে ওঠে । স্বর্গের রূপকল্পনা বা অলৌকিক ধ্যান ধারণা সাধারণ মানুষের ছবি এঁকেই তিনি বোঝান।

তাঁর ছবির আর এক বৈশিষ্ট্য হল অলংকরণ। গোটা পট জুড়েই এই ডিজাইন। মেয়েদের সাজ গোজ থেকে মাটির বাড়ির দেওয়ালে, গোয়ালার দইয়ের হাঁড়ি - সবেতেই রয়েছে এই অলংকরণ। সত্যিই তো, খেয়াল করলেই দেখা যায় প্রকৃতির সর্বত্র রয়েছে এই অলংকারময়তা। হাঁসের পাখায়, প্রজা প্রতিতে, ফুলে, ফলে লতা গুল্মের পত্র বিস্তারে, দিগন্ত জোড়া সবুজ ক্ষেতে আর আলে সর্বত্রই সুসমঞ্জস রঙের বিন্যাস রেখার বিন্যাস রয়ে গেছে । মানুষই একসময় তাকে তুলে এনেছিল নিজের মাটির দাওয়ায়

নানান মাঙ্গলিক চিহ্নের মধ্য দিয়ে । তার আলপনা দেবীর আগমনের পথটি আরো সুন্দর করে তুলতো। শুধু তাই নয় জন্মলগ্ন থেকেই মানুষের ব্যবহার্য জিনিসগুলি শুধু ব্যবহারোপযোগী করেই সে সন্তুষ্ট হয়নি, তাকে সে সুন্দরও করতে চেয়েছে। তাই অস্ত্রের গায়েও সে নকশা করেছে । এইভাবে শিল্পের যে দিকটি জীবনের সঙ্গে জড়িত তাকেও রামানন্দ নিজের ছবিতে গ্রহণ করেছেন এক প্রধান উপাদান হিসাবে ।

তাঁর এখনকার ছবিতে সারা ছবি জুড়ে রঙের খেলা । উজ্জ্বল রঙের ব্যবহারে এবং ছন্দময় রেখার চলনে রামানন্দের ছবিচিহ্নিত। রঙ রেখার সীমা মানেনা, সে ছড়িয়ে পড়ে বস্তুর পাশের শূণ্যতায়। বস্তুই যেন সেখানে রঙ বিকীরণ করে। রেখা ধরে রাখে বস্তুর আকারকে। রঙ ও রেখার এমন যুগলবন্দি তাঁর ছবিতেই দেখা যায় ।

এ সমস্ত করণকৌশলকে ছাপিয়েও ছবির এক আনন্দ ফুটে ওঠে গোটা পট জুড়ে। কেননা তাঁর ছবির নরনারী, পশুপক্ষী, প্রকৃতির সমস্ত কিছুই পূর্ণতা নিয়ে হাজির হয়। তাঁর অসাধারণ টেম্পারা গুলি অবনীন্দ্র নন্দলাল প্রবর্তিত ভারতীয় ধারাও বাংলার পটচিত্রকে ছুঁয়ে এক অন্য মাত্রা নেয় যা তথাকথিত ভারতীয় চিত্ররীতি (ইন্ডিয়ান স্টাইল) নয়,বরং ভারতশিল্পের(মূলত ভাস্কর্য কেন্দ্রিক) ঐশ্বর্যের অনুসন্ধান। আমাদের ভাস্কর্যেই দেখা যায় সেই পূর্ণতা (টোটালিটি)। রামানন্দের ছবির উপাদান উপকরণ গুলিও এই গুণে সমৃদ্ধ। তাদের সুডৌল গঠন , ছন্দময় দেহভঙ্গি , মুহূর্তেই দর্শকের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে। তাই তাঁর ছবি দর্শকের শ্রেণীগত গন্ডি মুছে দেয়, সময়ের সীমাও অতিক্রম করে চলে।

কলেজস্ট্রিট পত্রিকা থেকে।